মুশকিল

(গল্পগ্রন্থ – জ্যোতিরিঙ্গণ)

পিসিমা সকালে উঠে আমায় বললেন—যা পয়সা নিয়ে গিয়ে দেখে আয় দিকি বনগাঁর খোঁয়াড়ে, যদি সেখানে গরুটা গিয়ে থাকে,—দেখেই এসো না কেন বাপু—

মা বললেন—ওকে পাঠানো আর না পাঠানো দু-ই সমান। ও কি করবে সেখানে গিয়ে? ও পারবে না, ওর বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই, কখনো ঘরের বার হয়নি।

এ কথায় আমি চটে গেলাম মনে মনে। বললাম—তুমি পাঠিয়েই দ্যাখো না কেন, পারি কি পারিনে! আমি বনগাঁ গিয়ে আর গরু দেখে আসতে পারিনে—খুব পারি।

বনগাঁ আমি কখনো যাইনি। শুনেছি সে মস্ত বড় শহর-জায়গা। কত গাড়িঘোড়া, লোকজন, রেলগাড়ি—আরো কত কি দেখার জিনিস সেখানে। আমাদের গ্রামের কিছু দূরে যে পাকা রাস্তা আছে, সেই রাস্তা ধরে পুবদিকে তিনক্রোশ রাস্তা নাকি যেতে হয়।

ওখানে বড় স্কুল আছে। আমাদের গাঁয়ের গিরীন ডাক্তারের ছেলে সুরেন সেখানে স্কুলবোর্ডিঙে থেকে পড়ে। মাঝে মাঝে ফিরে এসে বনগাঁ শহরের কত আশ্চর্য আশ্চর্য গল্প করে শুনেছি। সেখানে যাবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মা কিছুতেই আমাকে সেখানে যেতে দেবে না। গেলে নাকি আমি গাড়িঘোড়া চাপা পড়ব। গাড়িঘোড়া কি লোকের দিকে তেড়ে ছুটে আসে? সাবধান হয়ে বেড়ালেও কি লোকে গাড়িঘোড়া চাপা পড়ে?

অনেক বুঝিয়ে মাকে রাজী করাই। আট আনা পয়সা দিয়ে মা বললেন—এটা কাপড়ের খুঁটে আলাদা করে বেঁধে নে—তুই আবার যে রকম ছেলে, হারিয়ে ফেলবি কোথায়! আর তুই কিছু কিনে খাস, এই নে চার পয়সা।

আমি বললাম—আরো দুটো পয়সা দাও।

—আবার কি হবে?

—দাও না। খেলনা কি নতুন জিনিস কিনে আনব।

—যা নিয়ে।

ভাদ্রমাস। চারিদিকে সবুজ আমন ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে ঢেউ খেলছে। বন-ধুঁধুলের বড় হলদে ফুল ঝোপে ঝোপে ফুটে রয়েছে। শুকনো কাঠ ভেঙে পড়েছে পাকা রাস্তার উপর একটা চটকাগাছের তলায়। একটা বিলিতি শিরীষগাছে মাকাল ফল পেকে ঝুলছে। পাটবোঝাই একখানা গরুরগাড়ি আমার আগে আগে চলেছে ক্যাঁচাক্যাঁচ করতে করতে।

আমার মন খাঁচা-খোলা পাখির মতো হয়ে গিয়েছে। কোথায় যেন চলেছি কত দূরে!

রক্তকুঁচের কাঁটালতায় হলুদ ফুল ফুটেছে, তার কেমন গন্ধ! লতা বেয়ে কাঠবেড়ালি উঠেছে ঝোপের মাথায়। দাঁড়িয়ে দেখে দেখে যেমন একটা ঢিল মেরেছি, অমনি পালিয়ে গেল।

পাটবোঝাই গাড়িটা এবার ধরে ফেলেছি। একটা বুড়ো মুসলমান গাড়ি চালাচ্ছে, একটি ছোট ছেলে পাটের বস্তার ওপর বাঁশ ধরে বসে আছে। বুড়োকে দেখতে আমাদের গাঁয়ের ময়জদি কাকার মতো।

আমি বললাম—কোথাকার গাড়ি?

বুড়ো গাড়োয়ান বললে—মনেকপুরির।

—কোথায় যাবে?

—বনগাঁয়ে কুণ্ডুদের আড়তে।

—আমায় নেবে?

—উঠতি যদি পারো ওপরে, তবে চলো।

—গাড়ি থামাও!

—থামাতি পারব না, পেছন দিয়ে ওঠো।

—হ্যাঁ, পড়ে মরি আর কি! যাও তুমি চলে!

—ওঠ না খোকা, ভয় কি?

—না, তুমি যাও–তোমার আগে বনগাঁ পৌঁছে যাব।

খানিকক্ষণ জোড় পায়ে হাঁটবার পরে কোথায় পড়ে রইল গরুরগাড়িটা। বার বার খুশির সঙ্গে পেছন ফিরে চেয়ে দেখতে লাগলাম। একজন বাগ্‌দি মস্ত বড় একটা মাছ নিয়ে চলেছে বনগাঁর দিকে। তাকেও গিয়ে জোর পায়ে ধরে ফেললাম। সে আমার দিকে ফিরে চাইলে। দু-একবার চাইবার পর বললে—বাবা, কোথায় যাবা?

—বনগাঁ।

—কেন?

—গরু পন্টে গিয়েছে, আনতে যাব।

—আপনাদের বাড়ি কনে?

—গোপালনগর।

—ওখানে তো পন্ট আছে।

—সে পন্টে নেই, আজ দুদিন হারিয়েছে। মা বললে, বনগাঁর পন্ট খুঁজে আসতে।

—আজকাল দুষ্টুমি করে দূরির পন্টে দেয়। তা চলো মোর সঙ্গে।

খানিকদূর গিয়ে পথের ধারে একটা বনজঙ্গলের মধ্যে তালগাছ থেকে ধুপ করে একটা তাল পড়ল। আমি ছুটে আনতে যাচ্ছি, মাছওয়ালা বাগ্‌দি আমাকে বললে—কোথায় যাচ্ছেন বাবা? যাবেন না—জঙ্গলের মধ্যে সাপখোপ আছে। এখন বিকেলে রোদ নেই, দেখতে পাবেন না। আর তাল নিয়ে বইবেন কেমন করে?

সে কথা ঠিক। বইব কি করে অত বড় তালটা সেকথা ভেবে দেখিনি। তাল পড়বার শব্দ হলেই দৌড়োনো চাই। তখন আরো মনে পড়ল আমাদের পুকুরধারেই জ্যাঠামশায়দের তালগাছ থেকে আজই সকালে দুটো বড় বড় তাল কুড়িয়ে এনেছি। গিয়ে আরো কত কুড়োবো—কি হবে এখান থেকে তাল বয়ে নিয়ে গিয়ে? রাস্তার দু-ধারে খালি বনজঙ্গল। এক জায়গায় বুনো করমচা পেকে আছে। দেখে তুলতে যাচ্ছি, আমার সঙ্গী বারণ করলে—যেয়ো না যেয়ো না, ও তুলো না—

—কেন?

—কেন আবার! বাড়ি থেকে সদ্য বেরিয়েছ ছেলেমানুষ, ও ফল খেলি হাড়ের জ্বর এখুনি টেনে বের করে এনে ফ্যালবে!

—আমাদের বাড়িতে তো কত খায়!

—খায় রেঁধে, কাঁচা কেউ খায় বলতি পারো?

ওর ওপর আমার বড় রাগ হল। ও কি আমার অভিভাবক, যা করতে যাচ্ছি তাতেই বাধা দিচ্ছে? তাল কুড়ুতে দেবে না, করমচা খেতে দেবে না, ভালো রে ভালো! তুমি তোমার পথে যাও, আমি আমার পথে যাই! আমি ওকে বললাম—বনগাঁ কতদূর হবে?

—এইবার চাপবেড়ে ছাড়ালি তবে বনগাঁ।

—তোমার বাড়ি কোথায়?

—সাতবেড়ে।

দূর থেকে একটা সাদা কোঠাবাড়ি চোখে পড়ছে। ওই হল বনগাঁ শহর। আমার মন আনন্দে ও ঔৎসুক্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। না জানি কত কি জিনিস এখুনি চোখে পড়বে! কত বড় শহর বনগাঁ, কি বড় বড় বাড়ি!

শহরে ঢুকে দু-পাশে দেখতে দেখতে চললাম। মাছওয়ালা বাগ্‌দি তখনো আমার সঙ্গ ছাড়েনি; সে বললে, চলুন, আপনি ছেলেমানুষ, আমি পন্টঘর আপনাকে দেখিয়ে দিই। আমি যদি তখন তার সদুপদেশ শুনতাম! যাক গে। আমি তখন ওর ওপর ভয়ানক বিব্রত হয়ে উঠেছি। আমি এসেছি বেড়াতে, বাবার আর মার শাসন থেকে দূরে। আমি এখানে যা খুশি তাই করব। তুমি কে হে বাপু সব সময়ে আমার পেছনে লেগে আছ? আমার গোরু আমি নিই না-নিই সে আমার খুশি। পন্টে গিয়ে গোরু পেলেই আমায় এখুনি গোরু নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে, আমি একটু বেড়িয়ে দেখতে পারব না? আমি এসেছি শহর বেড়িয়ে দেখতে।

বাগ্‌দি সত্যিই আমায় ছেড়ে এবার অন্য দিকে চলে গেল। আমি আজ বাড়ি ফিরব না। তুমি যাও।

আমি আরো এগিয়ে গিয়ে বাজারে পড়লাম। কি লোকজনের ভিড়! ঝুমঝুমি বাজিয়ে এক জায়গায় কি বিক্রি হচ্ছে! চানাচুর? সে আবার কি জিনিস? একটা লোক ঝুমঝুমি বাজিয়ে বলছে—চা-না-চু-র, মজার চানাচুর গরম! যে খাবে ও পস্তাবে, যে না খাবে ও ভি পস্তাবে—মজার চানাচুর গরম।

কি ও জিনিসটা? খেয়ে দেখব?

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম—কত দাম? কি জিনিস?

—চানাচুর গরম!

—এক পয়সার দেবে?

—কাহে নেহি দেবে বাবা? এই লাও!

লোকটা একটা শালপাতার ছোট ঠোঙা আমার হাতে দিলে। আমি ঠোঙা খুলে ভেতরের জিনিস দেখতে গেলাম তাড়াতাড়ি। ওমা, ছোলা ভাজা আর কি কি ভাজা! কেমন চমৎকার মশলা। একগাল খেয়ে দেখলাম—ওমা, কি চমৎকার! আর এক পয়সার চানাচুর নিলাম, বাড়ি নিয়ে যাব ছোট ভাইটার জন্যে।

এক জায়গায় একটা মুচি জুতো সেলাই করছিল। তার সামনে একটা লোহার তিনপায়া জিনিস, তার ওপর রেখে জুতোয় ঠুকছিল পেরেক। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম। সেখানে কি সব বড় বড় দোকান। কত রকম জিনিস সাজানো। একটা দোকানে নানারকম ফল বিক্রি হচ্ছে, সেই দিকে গিয়ে দেখি, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না আমাদের গাঁয়ে—কি বিক্রি হচ্ছে বলো তো! আম। কেউ কখনো শুনেছে ভাদ্র মাসে আমের কথা? আষাঢ়ের প্রথমে দু-একটা গাছে আম থাকতে দেখা যায় আমাদের ওদিকে—আম এখনো বিক্রি হয়, পাকা আম? আমি সেই ফলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমগুলো কতক্ষণ ধরে দেখলাম। কত শিলনোড়া একটা দোকানে। এত শিল-নোড়া কেনে কে? কত রকম টোপর বিক্রি হচ্ছে একটা দোকানে। টোপর তো মালীরা করে দেয় দেখেছি, দোকানে বিক্রি হয় জানতাম না। পেছনদিকে একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখি—এর নাম কী গাড়ি? বা রে! মানুষে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ তার ভেতর লোক বসে! একজনকে বললাম—ওটা কী গাড়ি?

—রিকশাগাড়ি বলে ওকে খোকা।

—রিকশাগাড়ি?

–হ্যাঁ। দেখিনি কখনো? তোমার বাড়ি কোথায়?

—গোপালনগর। পাড়াগাঁ।

—তাই দেখনি। এ গাড়ি এখানেই নতুন এসেছে। একখানা মাত্র দেখছি।

আরো এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা ফাঁকা জায়গায় ভিড় করে গোল হয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। কি ব্যাপার?

দেখি একটা লোক ফড় খেলছে। চার পয়সা দিলে চার আনা ফেরত দিচ্ছে জিতলে। আমি ফড়খেলা আমাদের গাঁয়ে মেলার সময় দেখেছি। বাবা খেলতে দেয় না, নইলে আমার খেলার খুব ইচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছি, আরো অনেক লোক দেখছে। খেলছেও অনেক লোক। এই উপযুক্ত সুযোগ, আর আসবে না। মায়ের দেওয়া আট আনাটা কিছু না ভেবেই একটা ঘরে দিলাম।

খেলার মালিক বললে—কার আধুলি?

—আমার।

—আধুলি উঠিয়ে নাও।

—কেন? আমি খেলেছি যে?

—না, তুমি আধুলি নিয়ে চলে যাও।

—না, আমি খেললাম যে! বা রে!

—হেরে গেলে আমার কোনো দোষ নেই কিন্তু খোকা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, আমি এবার ঠিক ধরেছি। জিতব বলে ও শুধু ঐ রকম করছে। চালাকি পেয়েছে? আমি বললাম, না, তোমার কোনো দোষ কেন থাকবে?

লোকটি অমনি ফড়ের বাটি তুলে বললে—এই চলে এসো—ছক্কা। তোলো দান।

বাস্! আমার আধুলি তিরির ঘরে। চক্ষের নিমেষে সে আধুলিটা আত্মসাৎ করলে।

বললে—গেল খোকা! তোমায় বললাম ভালো কথা, তোমার আধুলি তুলে নাও—শুনলে না!

আমার চোখে যেন সরষের ফুল দেখলাম।

হাতে আর একটা পয়সাও নেই আমার। পন্টের গরু কি দিয়ে খালাস করে নিয়ে যাব? সর্বনাশ! সেই মাছওয়ালা বাগদি লোকটা সৎপরামর্শই দিয়েছিল, তখন কেন শুনলাম না? বাবা অবিশ্যি বাড়ি থাকেন না, মা শুনলে কি বলবে? আট-আনা পয়সা গেল! এক-আধটা কি? আহা, সেই অপূর্ব বস্তু চানাচুরও যদি কিনতাম ঐ আট আনা দিয়ে, এতগুলো দিত! বাড়ির সবাই খেয়ে খুশি হত। এভাবে একেবারে মূলে-হাভাত হত না আধুলিটা।

না, আর কোথাও দাঁড়ালাম না।

মন বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শহর অতি খারাপ জায়গা। পেট চুঁই-চুঁই করছে ক্ষিদেতে। চার পয়সা আছে সঙ্গে, ওই পয়সায় পান কিনে নিয়ে যেতে হবে মার জন্যে। মা পান পেলে খুশি হয়। হয়তো আধুলি খোয়ানোর রাগটা একটুখানি কমতে পারে। পান কোন দিকে বিক্রি হয়? পান নিয়ে যাই চার পয়সার। বেলা পড়ে আসছে, তিন ক্রোশ রাস্তা এখন যেতে হবে।